ইউনিট ৫
ফলের রোগ ও
প্রতিকার

ইউনিট ৫ ফলের রোগ ও প্রতিকার

ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ফলের মধ্যে যেসব উপাদান আছে তা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন। আমাদের শরীর রক্ষার্থে যেসব ভিটামিন প্রয়োজন তার সবগুলো ফলে রয়েছে। এছাড়া, ফলে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খণিজ উপাদান আছে যা দেহের বিপাক কার্যাবলী স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। পাকা আম, পেঁপে, কাঁঠাল, বেল, খেজুর, কমলা প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। কলা, বাদাম, লিচু, আঙ্গুর, কমলায় ভিটামিন 'বি-১' বা থায়মিন এবং পেঁপে, বেল, লিচু, আনারস, কদবেল, ডালিমে ভিটামিন 'বি-২' বা রাইবোফ্লাভিন থাকে। পেয়ারা, লেবু, কমলা, আমলকি, লিচু, আনারসে ভিটামিন 'সি' বা অ্যাসকরবিক এসিড থাকে। উপরোক্ত পুষ্টি উপাদানের জন্য খাদ্যকে সুষম করতে হলে ভাত ও তরিতরকারির সঙ্গে আমাদের খাদ্যতালিকায় কিছু না কিছু ফল থাকা উচিত। খাদ্য হিসেবে ফলের সুবিধা হলো যে, রান্না ছাড়াই এদেরকে খাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ফল চাষের খুবই উপযোগী এবং একরপ্রতি জমিতে যে কোনো মাঠ ফসলের তুলনায় ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হওয়ায় আর্থিক দিক দিয়ে কৃষকের আরও বেশি লাভ হয়। ফল বাগানে ফল গাছের ফাঁকে ফাঁকে আদা, হলুদ, শাকশবজি লাগিয়েও বাড়তি আয় করা সম্ভব। অনেক পতিত জমি আছে যেখানে কোনো মাঠ ফসল করা যায় না (যেমন- রেল লাইনের পাশ, রাস্ ার ধার, পুকুরের পাড়, বাড়ির আনাচেকানাচে ইত্যাদি) সেখানে ফলের গাছ লাগিয়ে জমির সদ্ব্যবহার করা যায়। ওষুধ হিসেবে ফলের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফল ও ফল গাছ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখে। রাস্ ায় ছায়া প্রদান, রোদ ও ঝড়ের তীব্রতা কমানো, জমির ক্ষয় রোধ ইত্যাদিতেও ফল গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে সারাবছরই বিভিন্ন জাতের ফল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগের দরুন ফলের উৎপাদন অনেক স্থানে আশাতীত হয় না। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফলের বিভিন্ন রোগ ও উহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আম, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি ফল গাছের রোগ, রোগের নমুনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ আম গাছের রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আম ও আম গাছের কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণের নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।

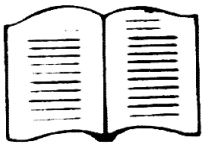

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ *Colletorichum gloeosporioides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে আমের এনথ্রাকনোজ রোগ হয়। এটি আমের খুবই ক্ষতিকর রোগ।

পাতায় বাদামি রঙের ছোট ছোট কিছুটা কোনাচে ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের পাতা, ডাল, ফুল ও ফল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাতায় বাদামি রঙের ছোট ছোট কিছুটা কোনাচে ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়। চিত্র ৫০ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত আম পাতা, মঞ্জুরী ও ফল দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫০ ঃ আমের এনথ্রাকনোজ রোগ; উপরে (বামে)- দাগযুক্ত আক্রান্ত পাতা (ডানে)- আক্রান্ত কালচে মঞ্জরী; নিচে- বিভিন্ন পর্যায়ের দাগযুক্ত আম

বয়স্ক দাগের তন্তু ফেটে যায়। পাতার বোঁটা আক্রান্ত হলে এটি কালো হয়ে ঝরে পড়ে। ডালের গায়েও কালো দাগ উৎপন্ন হয়। আক্রান্ত কচি ডাল আগা থেকে গোড়ার দিকে শুকাতে থাকে। মঞ্জরী আক্রান্ত হলে ফুল কালো হয়ে ফল ধরার আগেই শুকিয়ে যায়। মৃদুভাবে মঞ্জুরী আক্রান্ত হলে তাতে কিছু ফল ধরলেও রোগ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ে। বড় আম আক্রান্ত হলে তার গায়ে কালো কালো কিছুটা ডুবা (sunken) ধরনের দাগ হয়। এ দাগ বৃদ্ধি পেয়ে আয়তনে বড় হতে থাকলে ফল পচতে শুরু করে।

দমন ঃ গাছের আক্রান্ত অংশ এবং মাটিতে পড়ে থাকা আক্রান্ত অংশসমূহে ছত্রাক বেঁচে থাকে বিধায় গাছের মরা ডাল ও নিচের যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে। ফুল আসার সময় কয়েক দিন পরপর ৩-৪ বার ও গুটি ধরার সময় ২-৩ বার

ছত্রাকনাশক (যথা- বেনলেট, ডায়থেন এম-৪৫) স্প্রে করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ছত্রাকনাশক অবশ্যই স্প্রে করতে হবে নতুবা মুকুল ঝরে যাবে। ফল পচা কমানোর জন্য ৫১° সে. উষ্ণতার পানিতে আমকে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে পানি মুছে সংরক্ষণ করতে হবে।

সুটি মোল্ড (Sooty mold)

কারণ ঃ এ রোগটি *Capnodium ramosum* নামক ছত্রাকের দ্বারা হয়।

লক্ষণ ঃ বস্তুত ছত্রাকটি প্রত্যক্ষভাবে গাছে পরজীবী হিসেবে রোগ সৃষ্টি করে না। কতকগুলো পোকামাকড় গাছের পাতায় এক প্রকার মিষ্ট রস নিঃসরণ করে। এ মিষ্ট রসে ছত্রাক জন্মে ও খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে পাতার উপরের দিক ছেয়ে ফেলে। ছত্রাক কালো স্পোর উৎপন্ন করলে তা রসের সঙ্গে লেপটে পাতাকে কালো ও কুৎসিত করে ফেলে। পাতার উপরটা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম ও স্পোর দ্বারা আবৃত থাকায় গাছের সালোকসংশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং ফল ছোট হয়।

দমন ঃ কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম সেভিন) ছিটিয়ে পোকামাকড় ধ্বংস করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ওষুধ ছিটানোর পরপরই আঁঠালো স্টার্চ সলিউশন প্রয়োগ করা দরকার। কারণ ঐ আঁঠালো সলিউশনে পত্রস্থিত ছত্রাক আঁটকে যায় এবং পরে সেগুলো শুকিয়ে ছত্রাকসহ টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর আর একবার কীটনাশক ছিটাতে হবে।

পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

কারণ ঃ *Oidium mangiferae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী, কচি ফলে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয়ে থাকে। গাছের সব স্থানই প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে।

লক্ষণ ঃ কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী, কচি ফলে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয়ে থাকে। সব স্থানই প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। পুষ্পমঞ্জরী এ রোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফল ঝরে পড়ে। এছাড়া আম অনেকটা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাতে স্বাভাবিক রঙও হয় না।

দমন ঃ ফুল হওয়ার সময় ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গন্ধকজাতীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ডাইনোক্যাপ ছত্রাকনাশক ছিটিয়েও ভালো ফল পাওয়া যায়।

বৃন্ত পচা

কারণ ঃ *Diplodia natalensis* নামক ছত্রাক এ রোগ সৃষ্টি করে।

রোগগ্রস্থ আম সম্পর্ণ আম কালো হয়ে যায়। আমের ভিতরের অংশ বাদামি এবং নরম হয়ে যায়।

লক্ষণ ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলের বোঁটার গোড়ার নিচে চারিদিক দিয়ে পেরিকার্প (pericarp) কালচে হয়ে আসতে থাকে। এ দাগ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বৃন্ত কে ঘিরে ফেলে এবং ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আম কালো হয়ে যায়। রোগগ্রস্ত আমের ভিতরের অংশ বাদামি এবং নরম হয়ে যায়।

দমন ঃ আমকে ৫-৬% বোরাক্স সলিউশনে ৪৩° সে. উষ্ণতায় তিন মিনিট ডুবিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া শুষ্ক এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় আম সংগ্রহ করার পরপরই তা গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নাড়াচাড়ার সময় আমে যেন ক্ষতের সৃষ্টি না হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

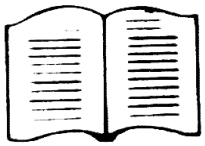

সারমর্ম ঃ এনথ্রাকনোজ রোগে পাতায় বাদামি রঙের কোনাচে দাগ উৎপন্ন করে। বোঁটা আক্রান্ত হলে এটি কালো হয়ে আম ঝরে পড়ে। আক্রান্ত মঞ্জরীর ফুল কালো হয়ে ঝরে পড়ে। বড় আমে কালো

রঙের ডুবা ধরনের দাগ পড়ে। সুটি মোল্ডে পাতার উপরটাকে কালো ও কুৎসিৎ করে ফেলে। পাউডারি মিলডিউ রোগে পাতা ও ফল প্রথমে সাদা এবং পরে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে আমের এসব রোগ দমন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। এনথ্রাকনোজ রোগ গাছের কোন্ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কচি কচি ডালে
- গ) কেবল মঞ্জরীতে
- ঘ) পাতা, ডাল, ফুল ও ফলে

২। আমের এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে কখন ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়?
- ক) ফুল আসার সময় কয়েকবার
- খ) গুটি ধরার সময় কয়েকবার
- গ) আমে আঁটি হওয়ার সময় কয়েকবার
- ঘ) ফুল আসার এবং গুটি ধরার সময় কয়েকবার

৩। পাউডারি মিলডিউ রোগ গাছের কোথায় হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কচি ফলে
- গ) কেবল পুষ্পমঞ্জরীতে
- ঘ) কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী ও কচি ফলে

৪। পাউডারি মিলডিউ রোগ মারাত্তক আকারে দেখা দিলে গাছে কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়?
- ক) পাতা বেঁকে যায়
- খ) পাতা শুকিয়ে যায়
- গ) ফল পচে যায়
- ঘ) পাতা ও ফল ঝরে পড়ে

৫। পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনকল্পে কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?
- ক) ফুল ধরার সময় কুপ্রভিট স্পে করতে হবে
- খ) ফুল ধরার সময় কয়েকবার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- গ) ফুল ধরার সময় ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গন্ধকজাতীয় ছত্রাকনাশক (যথা-ডাইনোক্যাপ, গুঁড়ো গন্ধক চূর্ণ) স্প্রে করতে হবে।
- ঘ) ফুল ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে

পাঠ ৫.২ কলা গাছের রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কলা গাছের কতিপয় ক্ষতিকর রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগসমূহের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।

সিগাটোকা (Sigatoka)

কারণ ঃ *Cercospora musae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে কলা গাছের সিগাটোকা রোগ হয়।

অনেকগুলো দাগ একত্রে যুক্ত হয়ে পাতার অনেকটা অংশ জুড়ে ফেলে এবং তখন পাতাকে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে পাতাতে শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমান্তরালভাবে ছোট ছোট ও লম্বাটে ঈষৎ হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ ক্রমশঃ বেড়ে লম্বা হতে থাকে এবং গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। ক্রমে দাগের মধ্যবর্তী স্থান শুকিয়ে হালকা ধূসর বর্ণ হয়ে যায়। এসব দাগ চারদিকে প্রায়ই হলুদ আভাতে ঘেরা থাকে। ধীরে ধীরে অনেকগুলো দাগ একত্রে যুক্ত হয়ে পাতার অনেকটা অংশ জুড়ে ফেলে এবং তখন পাতাকে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়। মরা পাতার বৃন্ত প্রায়ই ভেঙ্গে যায়। এর ফলে আক্রান্ত গাছে গুটি কতক পাতাকে খাড়া হয়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত কচি পাতায় এ রোগ বেশি হয়। রোগাক্রান্ত গাছে ফল ছোট হয় এবং অকালে পেকে যায়। চিত্র ৫১ এ সিগাটোকা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ কলা আহরণের পর গাছের সব পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত গাছে ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার স্প্রে করে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। রোগপ্রতিরোধী জাতের কলা সংগ্রহ করে তার চাষ করলে রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। গাছ একটু ছায়া পেলে পাতায় শিশির কম পড়ে এবং রোগের প্রকোপ কমে।

চিত্র ৫১ ঃ কলাগাছের সিগাটোকা রোগ
(হলুদ আভা দ্বারা ঘেরা বাদামি দাগযুক্ত পাতা)

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ কলার এ রোগটি *Gloeosporium musarum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ কচি কচি ফলের বোঁটার কাছাকাছি স্থানে খোসায় প্রথমে কালচে রঙ হতে দেখা যায়। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক বৃদ্ধির জন্য আক্রান্ত অংশে বাদামি রঙের আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্ত ফল, ফলের বোঁটা, এমনকী সমস্ত ছড়ার কলায় রোগের লক্ষণ প্রকট আকারে দেখা দেয়। কলা বিকৃত হয়ে যায় এবং কলার শাঁসেও দাগ ধরে।

দমন ঃ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কলা পুরোপুরিভাবে বের হয়ে গেলে মোচা কেটে ফেলতে হবে। কলার ছড়ি বের হওয়ার পর ডায়থেন এম-৪৫ (প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম) বা ব্যাভিস্টিন (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দু'সপ্তাহ পরপর আরও দুবার ওষধ ছিটাতে হবে।

গুচ্ছপাতা (Bunchytop)

কারণ ঃ এ রোগটি *Musa virus*-ও দ্বারা হয়। কেউ কেউ মনে করেন এ রোগ মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সংঘটিত হয়।

আক্রান্ত গাছের আগায় অনেকগুলো ছোট ছোট পাতা খাড়া অবস্থায় জটলা বেঁধে থাকায় গাছের মাথাটা গুচ্ছাকার দেখায়। গুচ্ছাকারে পাতা থাকে বলে এই রোগের নাম তাই গুচ্ছমাথা বা গুচ্ছাপাতা দেয়া হয়েছে।

লক্ষণ ঃ প্রথমে আক্রান্ত গাছের পাতাতে নিচের দিকে শিরায় আঁচড়ের ন্যায় গাঢ় সবুজ রঙের দাগ দেখা দিতে থাকে। পরে দাগগুলো মধ্যশিরা ও বৃন্তে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ক্রমশঃ ছোট এবং চিকন হয়ে যায় এবং তাদেরকে সোজা হয়ে থাকতে দেখা যায়। পাতার কিনারায় সমভাবে সবুজ রঙ থাকে না এবং কিনারা কুঁচকে ঢেউতোলা টিনের মতো হয়ে যায়। অনেক সময় কচি পাতাটি সম্পূর্ণভাবে বের হওয়ার আগেই আর একটি নতুন পাতা বের হয়ে আসে। এর ফলে গাছের আগায় অনেকগুলো ছোট ছোট পাতা খাড়া অবস্থায় জটলা বেঁধে থাকায় গাছের মাথাটা গুচ্ছাকার দেখায়। গুচ্ছাকারে পাতা থাকে বলে এই রোগের নাম গুচ্ছমাথা বা গুচ্ছপাতা দেওয়া হয়েছে। রোগগ্রস্থ গাছে স্বাভাবিক নিয়মে মোচা বের হতে পারে না। ভূয়া কান্ড ফেটে খুবই ছোট আকারের মোচা বের হয়। চিত্র ৫২ এ গুচ্ছপাতা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫২ ঃ কলাগছের গুচ্ছপাতা রোগ
(গুচ্ছকারে সৃষ্টপাতা লক্ষণীয়)

দমন ঃ এ রোগ যে এলাকায় নেই সেখানকার সুস্থ গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্রই তা সমূলে উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দিতে পারলে গাছের রোগ সহনশীলতা বাড়ে। জাবপোকার উপদ্রব হলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

পানামা (Panma)

কারণ ঃ এ রোগ গাছের একটি মারাত্তক রোগ এবং রোগ হলেই গাছ মরবে। *Fusarium oxysporium* f.sp. *cubense* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের বয়স ৫-৬ মাস হওয়ার পর থেকে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় অল্প বয়সের গাছেও এ রোগ ধরা পড়তে পারে। আক্রান্ত গাছে প্রথম বাহিরের দিকের সব চেয়ে পুরানো পাতার কিনারা ঈষৎ হলুদ হয়ে আসতে থাকে। ক্রমে তা মধ্যশিরার দিকে বিস্তৃত হয়ে গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। পরে ভিতরের পাতাগুলো একের পর এক হলদে হতে থাকে এবং বৃন্ত ভেঙ্গে পাতা ঝুলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। অনেক সময় মাঝের পাতা বাইরে মেলার আগেই তাতে দাগ ধরে পচে যায়। কিছু দিনের মধ্যে ক্ষেতে কেবলমাত্র ভূয়া কান্ডটিকে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় রোগাক্রান্ত গাছের কান্ডের গোড়ার দিকে লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। চিত্র ৫৩ এ পানামা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

অল্প বয়সের গাছ আক্রান্ত হলে তার থেকে মোচা বের হয় না। যে সকল গাছ মোচা বের হওয়ার পর আক্রান্ত হয় সেসব গাছে কলা বাড়তে পারে না এবং কলার গোড়ার দিক বেঁকে বোতলের গলার মতো হয়ে যায়।

আক্রান্ত গাছের ভূয়া কান্ড আড়াআড়িভাবে কাঁটলে রস সঞ্চালন নালীর মধ্যে মাঝে মাঝে লালচে রঙের দাগ দেখা যায়। এ দাগ মোথার মধ্যে খুবই স্তষ্ট দেখা যায়।

চিত্র ৫৩ ঃ কলা গাছের পানামা রোগ
(বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে পাতা হলদে হয়ে গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়া লক্ষণীয়)

দমন ঃ জমিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি থাকলে চুন প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি একরে ৭৭৫ কেজি চুন)। গোবর ও অন্যান্য সার মাটিতে প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বাড়ালে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। রোগ দেখা দিলেই গাছ সমূলে উঠিয়ে তাতে কেরোসিন মাখিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমন ধান চাষ করে ৫/৬ মাস জমি জলমগ্ন অবস্থায় রাখতে পারলে মাটি অনেকাংশে জীবাণুমুক্ত হতে পারে। চারা সংগ্রহ করার আগে বয়স্ক গাছের মোথা কেটে দেখতে হবে তাতে লাল দাগ আছে কি-না এবং দাগ থাকলে ঐ ঝাড়ের কোনো চারাই রোপণ করা যাবে না।

সারমর্ম ঃ সিগাটোকা রোগে পাতায় শিরার সমান্তরালে হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা বাদামি দাগ হয়। গুচ্ছ পাতা রোগে গাছের আগার দিকে ছোট ছোট পাতা জটলা বেঁধে গুচ্ছাকারে থাকে। পানামা খুবই মারাত্তক রোগ। এ রোগে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে পাতা হলদে হয়ে গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়ে এবং মোথার মধ্যে লালচে দাগ পড়ে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে সিগাটোকা ও এনথ্রাকনোজ রোগ, আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে নষ্ট করে ও কীটনাশক ছিটিয়ে গুচ্ছ পাতা রোগ এবং লাল দাগবিহীন মোথার চারা লাগিয়ে পানামা রোগ দমন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিগাটোকা রোগে পাতায় কী ধরনের দাগ পড়ে?
- ক) হলুদ আভাতে ঘেরা লম্বাটে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে
- খ) হলুদ আভাতে ঘেরা গোলাকার গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে
- গ) ধূসর বর্ণের লম্বাটে দাগ পড়ে
- ঘ) ধূসর বর্ণের বড় বড় আঁকাবাঁকা দাগ পড়ে

২। সিগাটোকা রোগ হলে গাছে কলা কেমন হয়?
- ক) কলা ছোট আকারের হয়
- খ) কলা বড় আকারের হয়
- গ) কলা ছোট হয়ে অকালে পেকে যায়
- ঘ) কলা ছোট হয় এবং পাকে না

৩। কলার এনথ্রাকনোজ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতার বৃন্তে কালচে দাগ দেখা দেয়
- খ) পাতার উপর বিক্ষিপ্তভাবে কালচে দাগ দেখা দেয়
- গ) কচি ফলের বোঁটার কাছে খোসার উপর কালচে রঙের দাগ দেখা দেয়
- ঘ) কচি ফলের বোঁটার উপর হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয়

৪। এনথ্রাকনোজ রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?
- ক) কলার ছড়ি বের হওয়ার আগে গাছে ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- খ) কলার ছড়ি বের হওয়ার সময় ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- গ) কলার ছড়ি বের হওয়ার পরে দুতিন বার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- ঘ) কলা পাকার সময় ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে

৫। কলার গুচ্ছ পাতা রোগজনিত গাছে মোচা কেমন হয়?
- ক) কান্ড মধ্য থেকে মোচা বের হয় না
- খ) স্বাভাবিকভাবেই মোচা বের হয়
- গ) ভূয়া কান্ড ফেটে খুবই ছোট আকারের মোচা বের হয়
- ঘ) ভূয়া কান্ড ফেটে স্বাভাবিক আকারের মোচা বের হয়

পাঠ ৫.৩ পেঁপে গাছের রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পেঁপে গাছের বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

মোজাইক রোগ

কারণ ঃ পেঁপে গাছে যেসব রোগ হয় তন্মধ্যে মোজাইক রোগ সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি করে। রোগটি পাপায়া মোজাইক ভাইরাস (Papaya mosaic virus) দ্বারা হয়।

আক্রান্ত গাছের পাতাতে সবুজ রঙের মধ্যে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ উৎপন্ন হয়ে মোজাইক লক্ষণ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের পেঁপে গাছে এ রোগ হতে পারে। তবে চারাগাছ আক্রান্ত হলে ক্ষতি বেশি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতাতে সবুজ রঙের মধ্যে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ উৎপন্ন হয়ে মোজাইক লক্ষণ সৃষ্টি করে। আগার দিকের কচি কচি পাতায় রোগের প্রথম সংক্রমণ ঘটে। রোগে গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে গাছ খর্বাকৃতি হয়। পাতা আয়তনে ছোট হতে থাকে। গাছে আগার দিকে এক গুচ্ছ পাতা বাদে প্রায় সব পাতা ঝরে পড়ে। অনেক সময় পাতাগুলো পাকিয়ে সুতার মতো হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতাকে বিকৃত হতে দেখা যায়। পুরানো পাতার কিনারা কুঁচকে যায়। রোগাক্রান্ত গাছের ফল ছোট ও বিকৃত হয়। অনেক ফলের গায়ে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ হতে দেখা যায়।

দমন ঃ এ রোগ দমন খুবই কষ্টকর। রোগপ্রতিরোধী জাতের পেঁপে গাছ (যথা- ক্যারিকা কলিফ্লোরা) লাগিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে চারা গাছে রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সব গাছ তুলে পুড়িয়ে নষ্ট করলে এবং কীটনাশক স্প্রে করে জাব পোকা দমন করলে রোগের সংক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।

এনথ্রাকনোজ রোগ

কারণ ঃ *Colletotrichum capsici* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ হয়। এ রোগটি পেঁপের ছত্রাকঘটিত রোগসম হের অন্যতম।

চিত্র ৫৪ ঃ পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ; বামে- প্রাথমিক পর্যায়ের হালকা হলুদ রঙের দাগযুক্ত পেঁপে; ডানে- গোলাকার কালচে দাগ ও উহার মধ্যস্থিত গোলাপি গুটিযুক্ত পেঁপে

লক্ষণ ঃ পাতা ও পেঁপে (কাঁচা ও পাঁকা) উভয়ই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোদের দিকে পেঁপের যে অংশ থাকে সেখানে প্রথমে হাল্‌কা হলদে রঙের দাগ পড়তে দেখা যায়। পরে ঐ স্থান বাদামি ও কিছুটা নরম হয়ে যায়। এ ক্ষতস্থানের মাঝে গোলাকার কালচে দাগ পড়ে। বড় বড় বয়স্ক দাগের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লালচে বা গোলাপি রঙের গুটি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। কান্ড আক্রান্ত হলে রোগাক্রান্ত অংশের বিপরীত দিকটা অনেক সময় চুপসে যায় এবং ধীরে ধীরে সে অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে এবং শেষে গাছ মরে যায়। চিত্র ৫৪ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত পেঁপে দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোদের দিকে রোগের সূচনা হয় বলে গ্রীষ্মকালে কলা পাতা বা অন্য কোনো জিনিষ দিয়ে গাছের কান্ড ও ফলকে বেঁধে প্রখর রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়া রোগগ্রস্ত অংশে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে ছত্রাকের সংক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

চারা ধ্বসা রোগ

কারণ ঃ *Pythium aphanidermatum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ধ্বসা রোগে মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগ হয় এবং ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে পড়ে।

লক্ষণ ঃ প্রথমে মাটি সংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ ক্রমে বেড়ে কান্ডকে বেষ্টন করে ফেলে। আক্রান্ত অংশ ধীরে ধীরে বাদামি হয়ে ভেতরে পচে যায়। রোদ ও বাতাসে আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে সুতোর মতো হয়ে যায়। পচা স্থানে চারা গাছ হেলে পড়ে এবং কয়েক দিনেই মরে যায়। চারা ধ্বসা রোগে বীজতলায় প্রচুর গাছ নষ্ট হয়ে যায়। চিত্র ৫৫ এ চারা ধ্বসা রোগে আক্রান্ত পেঁপে গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে এ রোগ বেশি হয় বিধায় উঁচু এবং সুষ্ঠু পানি নিকাশযোগ্য জমিতে চারা তৈরি করতে হয়। মাটিতে জীবাণু থাকে এবং সেজন্য বপনের আগে বীজ ও বীজ তলার মাটি ওষুধ দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। চারা গজানোর পর সকালের দিকে রোদ ওঠার পর অল্প অল্প পানি দিয়ে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগ দেখা দিলে জমিতে চেসান্ট কম্পাউন্ড প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র ৫৫ ঃ পেঁপের চারা ধ্বসা রোগ (মাটিসংলগ্ন কান্ড শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে চারা ঢলে পড়া লক্ষণীয়)

সারমর্ম ঃ মোজাইক রোগে পাতায় সবুজ ও হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ পড়ে এবং পাতা পাকিয়ে সূতাকৃতি হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগ পাতা এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপেতে প্রথমে হলদে পরে ও বাদামি দাগ উৎপন্ন করে। ধ্বসা রোগে মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগ হয় এবং ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে পড়ে। মোজাইক ও এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে যথাক্রমে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ছিটাতে হবে। ধ্বসা রোগ দমনে বীজতলার মাটি শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগে পাতার সবুজ রঙের মধ্যে কী রঙের ছোপ ছোপ দাগ হয়?
- ক) বাদামি
- খ) হলুদ
- গ) বেগুনি
- ঘ) কালচে

২। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতা পাকিয়ে সুতাকৃতি হয়
- খ) পাতা গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়ে
- গ) পাতা চিকন হয়ে খাড়াভাবে থাকে
- ঘ) গাছে অনেক পাতা হয়

৩। পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ কোথায় হয়?
- ক) কেবল পাতায় হয়
- খ) কেবল কাঁচা পেঁপেতে হয়
- গ) কেবল পাকা পেঁপেতে হয়
- ঘ) পাতা এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপেতে হয়

৪। পেঁপের ধ্বসা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানি-ভেজা দাগ হয়
- খ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কালো দাগ হয়
- গ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে লালচে দাগ হয়
- ঘ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে গলের সৃষ্টি হয়

৫। চারা ধ্বসা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা কোন্‌টি?
- ক) মাটিতে গোবর সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে
- খ) মাটি ও বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বপন করতে হবে
- গ) সন্ধ্যার পর জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে
- ঘ) ভোরে রোদ ওঠার আগে জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে

পাঠ ৫.৪ পেয়ারা গাছের রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পেয়ারা গাছের দুটি মারাত্তক রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগ দুটির লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ দুটির দমন ব্যবস্থা বলতে ও লিখতে পারবেন।

এনথ্রাকনোজ রোগ

কারণ ঃ পেয়ারার এ রোগটি খুবই মারাত্তক এবং *Colletotrichum psidi* নামক ছত্রাক দ্বারা হয়।

লক্ষণ ঃ শিকড় ছাড়া বাকি সব অংশই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত ফল পাকার সময় এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ফলের উপর বেশ বড় বড় গোল ও গাঢ় বাদামি থেকে কালো রঙের দাগের সৃষ্টি হয়। দাগগুলোর মাঝে বসে যেয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে একের অধিক দাগ মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হয়। এসব দাগের ক্ষতের মধ্যে প্রায় গোলাকার বিন্দুর ন্যায় অনেক কালো

পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগে ফলের উপর বেশ বড় বড় গোল ও গাঢ় বাদামি থেকে কালো রঙের দাগের সৃষ্টি হয়।

চিত্র ৫৬ ঃ পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ
(বিভিন্ন পর্যায়ের দাগযুক্ত পেয়ারা)

কালো ছত্রাক অঙ্গ উৎপন্ন হয়। এগুলো ছত্রাকের স্তোর উৎপন্নকারী এসারভুলাস দিয়ে গঠিত। ক্রমে আক্রান্ত স্থান শক্ত ও খরখরে হয়ে যায়। ফল বিকৃত হয়ে ঝরে পড়তে পারে। এনথ্রাকনোজ রোগ ডালেও হতে পারে। আক্রান্ত ডাল আগা থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকাতে থাকে।এজন্য অনেকে এ রোগকে 'আগা শুকানো' রোগ বলে থাকেন। ডাল শুকানোর সংগে সংগে পাতাও ঝরে যায়। এ কারণে আক্রান্ত গাছে অনেক পত্রবিহীন মৃত, অর্ধমৃত বা রোগাটে ডাল দেখা যায়। চিত্র ৫৬ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত পেয়ারা গাছের ডাল দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোগাক্রান্ত ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফল ধরার সময় ও পরে ১৫ দিন পরপর কয়েকবার ছত্রাকনাশক (রোভরাল) প্রয়োগ করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

ঢলে পড়া রোগ

কারণ ঃ *Fusarium oxysporum psidi* এবং *Rhizoctonia bataticola* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে রোগের লক্ষণ গাছের একপাশের ডালে দেখা দেয়। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কান্ডটাই আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত ডালগুলোর পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়। কোনো কোনো ডালে নতুন পাতা জন্মায় না। কোনো কোনো ডাল পালায় দুচারটি নতুন পাতা জন্মালেও তা অল্প কয়েকদিনে শুকিয়ে যায়। ক্রমে সমস্ত গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং এক-দু বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড লম্বালম্বিভাবে কাটলে তার মধ্যকার টিসুকে বহুদূর পর্যন্ত বাদামি দেখায়। রোগাক্রান্ত গাছে কদাচিৎ ফল হয়। চিত্র ৫৭ এ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত পেয়ারা গাছর বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫৭ ঃ পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগের বিভিন্ন পর্যায়; উপরে (ডানে)- একপাশের ডাল ঢলে পড়েছে (রোগের প্রাথমিক পর্যায়); (বামে)- সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়েছে (রোগের চরম পর্যায়)

নিচে(বামে)- আক্রান্ত গাছের কান্ডমধ্যস্থিত টিস্যু বাদামি

দমন ঃ এ রোগের জীবাণু মাটিতে বেঁচে থাকে বিধায় ওষুধ স্প্রে করে কোনো ফল পাওয়া যায় না। গাছের গোড়ার দিকে কিছু স্থানের মাটি কুপিয়ে গন্ধক চূর্ণ প্রয়োগ করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। রোগাক্রান্ত গাছ সমূলে উঠিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা উচিত।

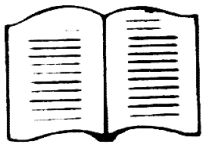

সারমর্ম ঃ এনথ্রাকনোজ রোগে ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসে এবং ফলে বাদামি থেকে কালচে গোলাকার দাগ হয়। ঢলে পড়া রোগে প্রথমে গাছের একপাশের ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানের কান্ডস্থিত টিস্যু বাদামি হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। ঢলে পড়া রোগের ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় গন্ধক চূর্ণ প্রয়োগ করে ও আক্রান্ত গাছ সমূলে উঠিয়ে নষ্ট করে দমনের চেষ্টা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পেয়ারা গাছের এনথ্রাকনোজ রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) সম্পূর্ণ গাছটি শুকিয়ে যায়
- খ) গোড়ার দিকের ডাল শুকিয়ে যায়
- গ) আগার দিকের ডাল শুকিয়ে যায়
- ঘ) বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ডাল আগার দিক থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে যায়

২। পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ গাছের কোন্ কোন্ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল ডালে
- গ) কেবল ফলে
- ঘ) পাতায়, ডালে ও ফলের যে কোনো অংশে

৩। পেয়ারার উপর এনথ্রাকনোজ রোগে কী ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়?
- ক) বড় বড় আঁকাবাকা লালচে দাগ
- খ) বড় বড় গোলাকার বাদামি থেকে কালচে দাগ
- গ) বড় বড় হলুদ আভাবেষ্টিত বাদামি দাগ
- ঘ) বড় বড় পানিভেজা দাগ

৪। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) প্রাথমিকভাবে গাছের একপাশের ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়
- খ) প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ গাছের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়
- গ) প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসে
- ঘ) প্রাথমিকভাবে গাছের সব ডালের পাতাই ঢলে পড়ে ও ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে

৫। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছের কান্ড চিরলে ভিতরের টিস্যু কেমন দেখায়?
- ক) হলুদ বর্ণ
- খ) বাদামি বর্ণ
- গ) গোলাপি বর্ণ
- ঘ) কালো বর্ণ

পাঠ ৫.৫ লেবু গাছের রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- লেবু গাছের ক্ষতিকর তিনটি রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।

ক্যাঙ্কার রোগ

কারণ ঃ *Xanthomonas campestris* pv. *citri* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্যাঙ্কার রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ রোগটি লেবু গাছের শিকড় ছাড়া সব অঙ্গেই হয়। কচি কচি পাতায় প্রথমে তেলের ছোট ছোট ফোটার ন্যায় দাগ পড়ে। রোগাক্রমণের কয়েক দিনের মধ্যে আক্রান্ত স্থান মোটা হয়ে মাঝখানকার টিস্যু সাদাটে রঙ ধারণ করে এবং ফোস্কার মতো উঁচু হয়ে বের হয়ে আসে। ক্রমে বয়স্ক দাগের রঙ বাদামি হয়ে খসখসে হয়ে যায়। তবে তার কেন্দ্রস্থল একটু নিচু থাকে বিধায় ঐ স্থান আগ্নেয়গিরির মুখের মতো মনে হয়। দাগের চারিদিক গ্রিজের (Grease) মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ আভা দিয়ে ঘেরা থাকে। এ দাগ পাতার উভয় পিঠে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্টাপিঠে বেশি হয় এবং এ পিঠ বেশি খসখসে মনে হয়। ধীরে ধীরে আরও অনেক দাগ সৃষ্টি হয় এবং আয়তনে বাড়তে বাড়তে পাতার অনেকাংশ জুড়ে ফেলে। অবশেষে দাগের মধ্যস্থিত টিস্যু শুকিয়ে খসে পড়ে। এর ফলে পাতায় ছোট ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ডাল বা কাঁটাতে দাগ হলে তা পাতার দাগের ন্যায় চারপাশ দিয়ে তেমন কোনো হলুদ আভা থাকে না। ফলের উপর যেসব দাগ হয় তার মুখগবহর বেশ পরিস্ফুট। ফলের খোসার উপরের দাগের চারপাশেও হলুদ আভা থাকে না। এ রোগটি কেবল খোসায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভেতরের রসালো অংশের বিশেষ ক্ষতি করে না। ফলে, এ রোগে ফলন কমে না কিন্তু দাগের জন্য বিশ্রী দেখায় এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। চিত্র ৫৮ এ ক্যাঙ্কার রোগে আক্রান্ত লেবু গাছ দেখানো হয়েছে।

> এ রোগটি খোসায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভেতরের রসালো অংশের বিশেষ ক্ষতি করে না। ফলে, এ রোগে ফলন কমে না কিন্তু দাগের জন্য বিশ্রী দেখায় এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয়।

চিত্র ৫৮ ঃ লেবু গাছের ক্যাঙ্কার রোগ
উপরে- পাতায় হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা বাদামি রঙের খসখসে দাগ; নিচে- ডাল ও কাঁটায় খসখসে দাগ

দমন ঃ দাগবিহীন সতেজ চারা সংগ্রহ করে লাগাতে হবে। শুকনো আবহাওয়ায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) রোগাক্রান্ত গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হয় এবং নতুন পাতা ও ডাল বের হওয়ার সময় এগ্রিমাইসিন নামক ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ৪০০ মিলিগ্রাম) ও তার সঙ্গে কিছু কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়। ফল ধরার ২-৩ মাস পর আবারও একবার ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

স্ক্যাব রোগ

কারণ ঃ *Elsinoe fawcetti* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

স্ক্যাব রোগে পাতা ও ফলে সূচালো আচিলের মতো সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে পাতার উপর ফিকে কমলা রঙের দাগ দেখা দেয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ক্যাব দাগ আঁচিলের ন্যায় উচু হয়ে ওঠে। ফলে, উপরটা খসখসে হয়ে যায়। আঁচিলের নিচে পাতার উল্টা দিকে কিছুটা ডেবে যায়। পাতার উভয় পিঠেই এ দাগ হতে পারে তবে উল্টা পিঠে বেশি হয়। পাতার যে পিঠে দাগ হয় তার উল্টা পিঠে ঠিক দাগ বরাবর আঁচিলের অগ্রভাগ বেশ সূচালো (conical) হয়ে উঠতে থাকে। আঁচিলের উপর ফিকে হলদে-কমলা রঙের মামড়ি পড়তে দেখা যায় এবং ক্রমে তারা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। চিত্র ৫৯ এ স্ক্যাব রোগে আক্রান্ত লেবুর পাতা, কাগজি লেবু ও মালটা দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫৯ ঃ লেবুর স্ক্যাব রোগ; উপরে (ডানে)- আঁচিলের ন্যায় স্ক্যাব দাগযুক্ত কোঁকড়ানো পাতা
বামে- সূচালোকৃতি স্ক্যাব দাগ (রোগের প্রাথমিক পর্যায়); নিচে (ডানে) - কাগজি লেবুর উপরে খসখসে স্ক্যাব দাগ
(মাঝে) - মালটার উপরে স্ক্যাবজনিত দাগ; (বামে) - স্ক্যাব দাগকে বড় করে দেখানো হয়েছে (দাগের মাঝখানটা ফাটা)

অতিশয় রোগাক্রান্ত পাতা অত্যধিক মাত্রায় কুচকে যায় ও বিকৃত হয়ে যায়। পাতা কুচকানো এ রোগের একটি বৈশিষ্ট্য। রোগের ব্যাপক প্রসার ঘটলে ডাল এবং ফলেও দাগের উপর অনুরূপভাবে ঘিয়ে বা কমলা রঙের আঁচিল দেখা দেয় এবং খোসার উপরটা কর্কের ন্যায় খসখসে হয়ে বিশ্রী দেখায়। রোগের শেষের দিকে আঁচিল ফেটে যেতে পারে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ফল ঝরে পড়তে পারে।

দমন ঃ গাছ থেকে আক্রান্ত পাতা, ডাল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা বের হওয়ার সময় একবার ও ফুল ফোটার পর আর একবার বোর্দো মিক্সচার বা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। নার্সারির কলমগুলোতে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার ছত্রাকনাশক স্প্রে করা ভালো।

ডাইব্যাক রোগ

কারণ ঃ *Colletotrichum gloeosporoides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ গাছে পুরানো পাতায় ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের দাগ পড়তে থাকে। ক্রমে এগুলো বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের অযৌন প্রজনন অঙ্গ (এসারভুলাস) অসংখ্য কালো কালো বিন্দুর ন্যায় উৎপন্ন হয়। ডালপালা আগার দিকে প্রথম আক্রান্ত হয় এবং ধূসর-রূপালি বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালের পাতা শুকিয়ে যায় এবং ফুল ও ছোট ছোট ফল ঝরে পড়ে। আক্রান্ত ডাল আগা থেকে শুরু করে নিচের দিকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে থাকে। এজন্য এ রোগকে 'আগা শুকানো' রোগও বলা হয়ে থাকে। ডাল মরে গেলে তাতে অসংখ্য এসারভুলাস কালো কালো বিন্দুর ন্যায় দেখা দেয়। ফল আক্রান্ত হলে তার উপত্বকে শক্ত কুঁচকানো বাদামি রঙের দাগ পড়ে। চিত্র ৬০ এ ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত লেবু গাছ দেখানো হয়েছে।

ডাইব্যাককে 'আগা শুকানো' রোগও বলা হয়ে থাকে। ডাল মরে গেলে তাতে অসংখ্য এসারভুলাস কালো কালো বিন্দুর ন্যায় দেখা দেয়।

চিত্র ৬০ ঃ লেবুগাছের ডাইব্যাক রোগ
(ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসছে)

দমন ঃ বাগানে নিরোগ চারা লাগাতে হবে। ঐ চারা বড় হওয়ার সময় গাছকে রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জানুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাসে একবার করে ৪ঃ৪ঃ৫০ হারে রোজিন বোর্দো মিক্সচার স্প্রে করতে হবে। গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিকড়ের চারদিকে সার ও সেচ দিয়ে গাছকে সতেজ রাখার চেষ্টা করতে হবে। মাটিতে ক্ষার বেশি থাকলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ৪.৫ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বছর লেবু সংগ্রহের পর গাছের ডালপালা ছেটে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ডাল ছাটার সময় যেন দাগের নিচেও কিছুটা অংশ কেটে ফেলা হয়। ডাল ছাটার পর কাটা অংশ দিয়ে জীবাণু যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কাটা মুখে আলকাতরা বা পেইন্ট লাগিয়ে দিতে হবে।

সারমর্ম ঃ ক্যাঙ্কার রোগ শিকড় ছাড়া সব অঙ্গেই ফোস্কার মতো উঁচু দাগ উৎপন্ন করে। দাগের চারিদকে গ্রিজের মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ আভা দিয়ে ঘেরা থাকে। এগ্রিমাইসিন স্প্রে করে এ রোগ দমন করতে হয়। স্ক্যাব রোগে পাতা, ডাল ও ফলের উপর আঁচিলের ন্যায় উঁচু দাগ হয় এবং তার উপরিভাগ খসখসে হয়। আক্রান্ত অংশসমূহ ধ্বংস করে ও রোগনাশক ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা হয়। ডাইব্যাক রোগ নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে এবং রোগনাশক ছিটাতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ক্যাঙ্কারজনিত দাগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) দাগ বাদামি রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- খ) দাগ লালচে রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- গ) দাগ হলুদ রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- ঘ) দাগ ছাইয়ে রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে

২। ক্যাঙ্কার রোগ গাছের কোন্ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কান্ডে
- গ) কেবল ফলে
- ঘ) পাতা, কান্ড ও ফলে

৩। ক্যাঙ্কারজনিত দাগ পাতার কোথায় হয়?
- ক) উভয় পিঠে হয় তবে উপরের পিঠে বেশি হয়
- খ) উভয় পিঠে হয়, তবে নিচের পিঠে বেশি হয়
- গ) কেবল উপরের পিঠে হয়
- ঘ) কেবল নিচের পিঠে হয়

৪। ক্যাঙ্কার রোগ দমনার্থে ছত্রাকনাশক কখন স্প্রে করতে হয়?
- ক) বছরের যে কোনো মাসে
- খ) বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে
- গ) বছরের জুন-আগষ্ট মাসে
- ঘ) বছরের জানুয়ারি-মার্চ মাসে

৫। স্ক্যাব রোগজনিত দাগ নতুন অবস্থায় দেখতে কেমন?
- ক) রূপালি রঙের মতো
- খ) পানিভেজার মতো
- গ) কালচে রঙের মতো
- ঘ) মাংসের রঙের মতো

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৬ ফলের রোগের নমুনা সংগ্রহ ও শণাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রোগাক্রান্ত ফল গাছ ও ফলের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- ফলের রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ ঃ আক্রান্ত ফল গাছ ও ফল, ভাসকুলাম, মাটি খোড়ার যন্ত্র, ডালাপালা ছাঁটার কাঁচি, চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ, ছোট করাত, হালকা প্রেস, ভারি প্রেস, হারবেরিয়াম শিট, ছোট আকারের কাগজের বাক্স, সেলোপেন, আঠা, গাম টেপ, লেবেল, নোটবুক, পেন্সিল, পারমানেন্ট কালি, হারবেরিয়াম শিট ও নমুনা সংরক্ষণের বিভিন্ন আধার, রোগ শণাক্তকরণের বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, চার্ট ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. নমুনার জন্য সর্বদা সদ্য আক্রান্ত বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বা তার অংশবিশেষ ও ফল সংগ্রহ করুন।

২. রোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় রোগের লক্ষণ কেমন হয় তা দেখার জন্য রোগের বিভিন্ন অবস্থার একাধিক নমুনা সংগ্রহ করুন (নমুনা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন উহাতে রোগজনিত ক্ষত ছাড়া পোকামাকড়জনিত ক্ষত বা অন্য কোনো ক্ষত না থাকে)।

৩. গাছের পাতা, শিকড়, কান্ড প্রভৃতির নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্যে নিয়ে হালকা প্রেসের মধ্যে চাপ দিয়ে রাখুন।

৪. নমুনা বড় হলে তা সংগ্রহ করে ভিজে কাগজ বা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ভাসকুলামে রাখুন।

৫. ফল সংগ্রহ করে সেলোপেন ব্যাগে মুখ বন্ধ করে রাখুন।

৬. বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসুন।

৭. ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে রোগ শণাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তক, ম্যানুয়াল, আলোকচিত্র ও ছবি এবং হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত শুকনো ও ভিজে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে রোগকে শণাক্ত করুন।

৮. সংগ্রহের পরপরই রোগ শণাক্ত করতে না পারলে নমুনাকে ফ্রিজ বা অন্য কোনো ঠান্ডাস্থানে রেখে দিন এবং সময় ও সুবিধা মতো শনাক্ত করার চেষ্টা করুন।

৯. বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করতে না পারলে নমুনার রোগগ্রস্ত অংশ থেকে প্যাথোজেন বা রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে পৃথক করে বা আবাদমাধ্যমে চাষ করে মাইক্রোস্কোপে দেখুন ও জীবাণুকে শণাক্ত করুন (জীবাণু শণাক্তকরণ পদ্ধতি পাঠ ২.৭ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

১০. পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়াম শিট ও কাঁচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করুন।

১১. ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শণাক্তকৃত রোগের নমুনাসমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজে অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করুন (বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি পাঠ ২.৭ এ আলোচনা করা হয়েছে)।

সারমর্ম ঃ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রোগের নমুনাসমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজে অবস্থায় কাঁচের আধারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। রোগের কোন্ পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়?
- ক) রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে
- খ) রোগ বর্ধনের মাঝামাঝি পর্যায়ে
- গ) গাছ বা তার কোনো অংশ মরে গেলে
- ঘ) রোগ বর্ধনের বিভিন্ন পর্যায়ে

২। নিশ্চিতভাবে রোগ শণাক্ত কীভাবে করতে হয়?
- ক) পুস্তকে বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে
- খ) রোগের বিভিন্ন ছবির সঙ্গে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে
- গ) হারবেরিয়াম শিটে বা কাঁচের আধারে রক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে
- ঘ) উপরের সবগুলোর সাহায্যে ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

১। আমের এনথ্রাকনোজ রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। কলা গাছের পানামা রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগ সম্বন্ধে লিখুন।

৪। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।

৫। লেবু গাছের কয়েকটি রোগের নাম কারণসহ লিখুন।

৬। ডাইব্যাক রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। গ

পাঠ ৫.২

১। ক ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। গ

পাঠ ৫.৩

১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ

পাঠ ৫.৪

১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ ৫.৫

১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ ৫.৬

১। ঘ ২। ঘ